বাবাসাহেব আম্বেদকরের অস্পৃশ্যতা বিরোধী সংগ্রাম: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

উত্তম দোলাই, তপন কুমার দে

সারসংক্ষেপ: বাবাসাহেব আম্বেদকরের ভাবনায় শূদ্রমুক্তি কেবলমাত্র রাজনৈতিক খাতে বহমান নয়। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ড. আম্বেদকরের এই রাজনৈতিক চিন্তা শূদ্রদের সামাজিক মুক্তির দর্শনকে সামনে রেখে শুরু হয়েছিল। তিনি রাজনৈতিক মুক্তির ভাবনাটিকে সামাজিক মুক্তির আঙিনায় রেখে বাস্তবায়িত করতে এবং শূদ্রদের সামাজিক পরিচয়ের জায়গাটি তৈরি করে দিতে চেয়েছেন। তাঁর কর্ম দর্শনের মূল কথা, সেই পরিচিতি জন্মের গুণে নয়, কর্মের গুনেই হওয়া উচিত। প্রাথমিকভাবে সামাজিক আন্দোলন সংগঠনের মধ্য দিয়ে তিনি শূদ্রদের সামাজিক অবস্থানের জায়গাটি বোঝাতে চেয়েছেন। অবশ্য তিনি একথাও জানতেন যে কেবল সামাজিক আন্দোলন করে শূদ্রদের সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তাই তিনি শূদ্রদের সামাজিক অধিকার রক্ষার বিষয়টিকে আইনি সুরক্ষার মাধ্যমে দৃঢ় করতে চেয়েছেন। বাবাসাহেব আম্বেদকরের ভাবনাকে কেবল শূদ্রদের সামাজিক এবং আইনি অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তার প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি আসলে শূদ্রমুক্তির হাত ধরে মানব মুক্তির এমন একটি আঙিনায় পৌঁছাতে চেয়েছেন, যেখানে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র বা বর্ণগত বিভেদ থাকবে না, যেখানে অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণের মানুষেরা বর্ণের অহংকার পরিত্যাগ করে মনুষ্যত্বের ধর্ম গ্রহণ করবে। বাবাসাহেব আম্বেদকরের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ সেই ইঙ্গিতই বহন করছে। আমাদের উদ্দেশ্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর কর্তৃক অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের উন্নয়নের প্রশ্নে গৃহীত পদক্ষেপগুলির দার্শনিক অনুসন্ধান।

বীজশব্দ: অস্পৃশ্যতা, মানব মুক্তি, সামাজিক মুক্তি, আইনি রক্ষাকবজ, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ববোধ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের আইনি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাবাসাহেব আম্বেদকর যে মহাসংগ্রামের সূচনা করেছিলেন তা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। জাতপাতকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সমাজের যে আক্রমণাত্মক ও ভগ্নদশা প্রচলিত ছিল (এখনও অনেকাংশে বর্তমান) তারই বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন দলিত নেতা বাবাসাহেব আম্বেদকর। অস্পৃশ্য দলিত জীবনের বিড়ম্বনার শিকার হয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন যে দলিত সম্প্রদায়কে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখাতে না পারলে শুধু যে দলিতরাই পিছিয়ে পড়বে তা নয়, ভারতীয় সমাজ পঙ্গুত্বের অধিকারী হয়ে অগ্রসরতার পথে প্রতি মুহূর্তে হোঁচট খাবে এবং পরিশেষে একটি ভগ্নজাতিতে পরিণত হবে। তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন যে তথাকথিত উচ্চবর্ণের আগ্রাসী মনোভাব অস্পৃশ্য শূদ্র সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচারের মূল কারণ। তাঁর সমসাময়িক মহাত্মা গান্ধী এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন উচ্চবর্ণের চেতনার পরিবর্তন ঘটাতে। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য শূদ্রদের নামকরণ করেছিলেন 'হরিজন'। তিনি মনে করতেন যে উচ্চবর্ণের চেতনার পরিবর্তন ঘটলেই নিম্নবর্ণের প্রতি তাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটবে এবং এইভাবে নিম্নবর্গীয়দের জন্য সমাজের দরজা উন্মুক্ত হবে। কিন্তু বাবাসাহেব আম্বেদকর এই ভাবনার সঙ্গে সহমত পোষণ করতে পারেননি। তিনি মনে করতেন যে শূদ্র সমাজের উন্নয়নের জন্য উচ্চবর্ণের আন্তরিক পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে থাকলে সেই উন্নয়ন কখনই বাস্তবরূপ লাভ করবে না। এর জন্য প্রয়োজন দলিত সম্প্রদায়ের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন। তিনি সমগ্র আন্দোলন দুটি স্তরে বিভক্ত করেছিলেন। প্রথমটি ছিল দলিত সম্প্রদায়ের দলিত চেতনার জাগরণ এবং দ্বিতীয়টি ছিল সেই দলিত চেতনা জাগ্রত অত্যাচারিত সমাজকে উচ্চবর্ণের দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখানো। তিনি যথার্থ অর্থেই তাঁর এই ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটাতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, দলিতদের অধিকার সমূহকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দান করে তিনি দলিত সম্প্রদায়ের আইনি রক্ষাকবজ তৈরী করে

দিয়েছেন। আজও সমগ্র ভারতবর্ষ দলিত উন্নয়নের প্রশ্নে বাবাসাহেব আম্বেদকর নির্দেশিত পথই অনুসরণ করে চলেছে। বাবাসাহেব আম্বেদকরের অস্পৃশ্যতা বিরোধী সংগ্রাম এবং একইসঙ্গে দলিত তথা শূদ্র মুক্তির বিষয়টি মূলত তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে , স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ (Liberty, Equality and Fraternity)। এই তিনটির মূল স্তম্ভ আম্বেদকরের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মূল চলিকাশক্তি। আপাতদৃষ্টিতে বাবাসাহেব আম্বেদকরের এই ত্রিমাত্রিক ভাবনার প্রয়োগ তাঁকে ভারতবর্ষে তথা মানবসভ্যতার অনন্য মানবতাবাদী চিন্তক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তবে গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে ড. আম্বেদকরের এই ত্রিমাত্রিক চিন্তার উৎসস্থলে রয়েছে তাঁর গভীর দর্শন ভাবনা। স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ এই ধারণাগুলি চারটি অর্থে প্রযোজ্য হতে পারে যথা— রাজনৈতিক অর্থে, সামাজিক অর্থে, ধর্মীয় অর্থে এবং পারমার্থিক অর্থে। রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় রাজনৈতিক বন্দীদশা থেকে মুক্তি। যে অর্থে ভারতবর্ষ ইংরেজদের হাত থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ করেছিল সেই অর্থে মুক্তি কথাটি ব্যবহৃত হতে পারে। সামাজিক মুক্তির ধারণাটি সামাজিক শোষণ, সামাজিক বঞ্চনা ইত্যাদির হাত থেকে মুক্তিকে বোঝাতে পারে। এক কথায়, তা সামাজিক পরিচয়হীন ব্যক্তির সামাজিক পরিচিতি (Social identity) লাভের বিষয়টিকে বোঝাতে পারে। আবার ধর্মীয় অর্থে মুক্তি কথাটি ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্তিকে বোঝাতে পারে। যে ধর্ম ভাবনা একধর্মের মানুষকে অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি ঘৃণাসূচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে বাধ্যকরে সেই ধর্ম ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের নামই ধর্মীয় মুক্তি। এক্ষেত্রে ধর্মভাবনা কখনই মানব ভাবনাকে প্রতিহত করে এগিয়ে যেতে পারে না, বরং মানব ভাবনা ধর্মভাবনাকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করে। সর্বোপরি পারমার্থিক অর্থে মুক্তি বলতে সনাতন ভারতীয় দর্শনে আলোচিত মুক্তির ধারণাকে বোঝায়, যেখানে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনসেতু রচিত হয়।

অনুরূপভাবে অপর দুটি স্তম্ভ অর্থাৎ সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ এর ধারণাগুলিও চারটি অর্থে প্রযুজ্য হতে পারে। সামাজিক অর্থে 'সাম্য' কথার অর্থ সমান সামাজিক অধিকারভোগের বিষয়টিকে বোঝায়। রাজনৈতিক 'সাম্য' কথাটিও সমানভাবে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার বিষয়টিকে নির্দেশ করে। ধর্মীয় অর্থে 'সাম্য' বলতে বোঝায় যে কোন ব্যক্তির যে কোন ধর্ম বেছে নেওয়ার অধিকার। পারমার্থিক অর্থে 'সাম্য' বলতে বোঝায় যে কোন মুক্তিকামী ব্যক্তির যে কোন পন্থা অনুসরণ করে মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার এবং পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার অধিকার।

সৌভ্রাতৃত্ববোধের ধারণাটিও চতুঃমাত্রিক অর্থ বহন করে। সামাজিক অর্থে সৌভ্রাতৃত্ববোধ এমন একটি ভাবনাকে বোঝায় যেখানে সমাজস্থ সমস্ত ধর্মের এবং সমস্ত বর্ণের মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত পরিচয়কে ছাপিয়ে মানবজাতির পরিচয়টি প্রতিষ্ঠিত হবে। 'মানুষ' , এই পরিচয়টি মুখ্য, কোন্ ধর্মের মানুষ বা কোন্ বর্ণের মানুষ, সেই পরিচয়টি গৌণ। ধর্মীয় অর্থে সৌভ্রাতৃত্ববোধ কথাটি ধর্মের সঙ্গে ধর্মের বিবাদকে সরিয়ে মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠাকে বোঝায়। রাজনৈতিক অর্থে সৌভ্রাতৃত্ববোধ একই ধারণার দ্বারা পরিচালিত। অর্থাৎ সেখানেও ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতের অস্তিত্বকে স্বীকার করেও পারস্পরিক মানববন্ধনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। পারমার্থিক অর্থে সৌভ্রাতৃত্ববোধ এক অদ্বৈতবাদী তত্ত্বের দিকে যাত্রা শুরু করে, সেখানে সমস্ত মানুষের উৎসের সন্ধান রয়েছে এবং সেই সন্ধানের শেষে মানবজাতির উৎপত্তির মূল কারণ হিসাবে এক অবাঙ্মানসগোচর সত্তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে (ভারতীয় দর্শন চিন্তা অনুসারে)। এই ভাবনার দ্বারা এটাই প্রতিপাদিত হয় যে সমস্ত মানুষ একই চেতনাজাত।

বাবাসাহেব আম্বদকর তাঁর অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন এবং দলিত তথা শূদ্র মুক্তির পথপ্রদর্শনে স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ এই ত্রিমাত্রীক ভাবনায় সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে এক অভিনব সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন, যার মূলে ছিল দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে বাল্যজীবন, শিক্ষাজীবন এবং কর্মজীবনে অনভিপ্রেত ও অমানবিক ঘটনা সমূহের সম্মুখীন হওয়া এবং তার থেকে প্রাপ্ত যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা।

শিক্ষাঙ্গনে, একই শ্রেণীর শিক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও সহপাঠীদের কাছ থেকে এবং শিক্ষাগুরুদের কাছ থেকে তিনি যে দলিত তথা শূদ্র হওয়ার কারণে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে সমগ্র দলিত তথা শূদ্রদের যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার পিতার কর্মস্থান গোঁরগাও যাত্রার সময় গরুর গাড়ির চালকের কাছ থেকে তিনি যে অপ্রত্যাশিত আচরণ

পেয়েছিলেন তাও তথাকথিত বর্ণ-ব্যবস্থার প্রতি তার অনাস্থার ভাবনাকে দৃঢ় হতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয় আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মহারাজা শাহজি রাও গাইকোয়াড় অধীনে কর্ম করার সময় তিনি যে ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথার শিকার হয়েছিলেন তা অস্পৃশ্যতা বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সর্বোপরি ১৯১৮ সালে সিডেনহাম কলেজে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পরেও তাঁকে অস্পৃশ্যতার কশাঘাতে জর্জরিত হতে হয়।

বাবাসাহেব আম্বেদকর এইসব অনিভিপ্রেত ঘটনার এক নির্যাস ফলশ্রুতি হল অস্পৃশ্যতা বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া এবং দলিত তথা শূদ্র মুক্তির পথ অনুসন্ধান করা।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বাবাসাহেব আম্বেদকেরের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল বিদেশ থেকে দেশের মাটিতে ফেরার পর। কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত তিনি সর্বত্রই পেয়েছেন ঘৃণা, অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা। এলফিনস্টোন কলেজও বাদ ছিল না। তিনি অনুভব করেছিলেন অস্পৃশ্যদের প্রতি তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়দের মনোভাব। তাঁর মনে অস্পৃশ্যতার আধার মাতৃভূমির সঙ্গে উচ্চশিক্ষালাভ করতে যাওয়া অধিষ্ঠানভূমি আমেরিকার মধ্যে স্বভাবতই তুলনা জেগে উঠল। তিনি সেখানকার সমাজে মিলে মিশে বুঝতে পেরেছিলেন স্বাধীনতা কাকে বলে, অস্পৃশ্যতা মুক্ত সমাজ কত উদার, প্রগতিশীল। তিনি স্থির সংকল্প করলেন অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করবেন আপন মাতৃভূমিকে। তাঁর স্থির লক্ষ্য ছিল অস্পৃশ্যতা দূর করা এবং অস্পৃশ্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তিনি প্রচেষ্টা চালালেন অস্পৃশ্যদের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করে মানুষের যথার্থ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে।

হিন্দুধর্ম চারটি বর্ণে বিভক্ত— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এখনকার সামাজিক হিসাব নিকাশ সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। ভারতীয় সমাজ কাঠামোয় বর্ণাশ্রম প্রথা তথা জাতপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রাচীনকাল থেকে বর্ণাশ্রম এবং জাতিভেদ প্রথার অবিচ্ছেদ্য ও প্রধান অঙ্গ হিসেবেই এদেশে অস্পৃশ্যতা গড়ে উঠেছে। অস্পৃশ্যতা সাধারণত হিন্দুধর্মের বর্ণভেদ প্রথাতেই লক্ষ্য করা যায়। বর্ণ হচ্ছে প্রাচীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত একটি সামাজিক বিভাজন, যার উৎপত্তি বেদ। প্রাচীন সাহিত্যসূত্র হিসাবে বেদেই সমাজের বর্ণ ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে পুরুষসূক্তের ভাষ্য অনুসারে ,

''ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীৎ বাহুরাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদবৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়তঃ।।''[১]

স্তোত্র অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা পরমপুরুষ ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে রাজন্য তথা ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পদযুগল থেকে শূদ্রের উৎপত্তি। বিরাট পুরুষের পদযুগল থেকে উৎপন্ন হওয়ায় শূদ্রের স্থান সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে এবং তাদের কাজ হল অপর তিন বর্ণের সেবা করা।

এই প্রকার বর্ণ বৈষম্যের বা জাতি বৈষম্যের ভিত্তি হল মানুষের স্বভাবধর্ম বা স্বভাবগুণ। যাঁর মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রধান তিনি 'ব্রাহ্মণ প্রকৃতি'র, যাঁর মধ্যে সত্ত্ব মিশ্রিত রজঃ গুণ প্রধান তিনি 'ক্ষত্রিয় প্রকৃতি'র, যাঁর মধ্যে তমো মিশ্রিত রজোগুণ প্রধান তিনি 'বৈশ্য প্রকৃতি'র এবং যাঁর মধ্যে তমোগুণ প্রধান তিনি 'শূদ্র'। প্রাচীন ভারতে মানুষের বর্ণ বা জাতি নির্ধারিত হয়েছে স্বভাবধর্ম বা প্রকৃতি অনুসারে, জন্মসূত্র অনুসারে নয়। ব্রাহ্মণ তনয় তার ক্ষত্রিয়সুলভ গুণের জন্য ক্ষত্রিয়রূপে, ক্ষত্রিয় তনয় তার ব্রাহ্মণসুলভ গুণের জন্য ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হতে পারত। প্রাচীন যুগে শূদ্রের ব্রাহ্মণত্বলাভের কাহিনী বিরল নয়। অর্থাৎ সমাজব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যেই প্রাচীন ভারতে গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণ বা জাতি নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ জাতিবৈষম্যের একাধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। সমাজের এক বৃহৎ অংশকে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে সমাজের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছে সুচিন্তিত ভাবে।

এই চার বর্ণের বাইরে আরো একটি জাতি ছিল, যারা চণ্ডাল বা অস্পৃশ্য। সম্ভবত কালক্রমে শূদ্ররাই অস্পৃশ্যে পরিণত হয়। সমাজে নিম্ন জাতিকে দলিত, পতিত, অস্পৃশ্য ইত্যাদি অসংখ্য বিচিত্র নামে অভিহিত করে চালানো হয়েছে। এই ভাগাভাগির জন্ম মনুসংহিতায়। অস্পৃশ্য বলতে বোঝায় যা ছোঁয়ার অযোগ্য, ছোঁয়া উচিত নয় এমন, ছোঁয়া নিষেধ এমন, অচ্ছুত, ঘৃণ্য এবং অশুচি।

অস্পৃশ্যতা নিম্নবর্ণের মানুষের একটি সামাজিক মর্যাদা, যারা ভৃত্য বা নিচু পেশায় নিয়োজিত। অস্পৃশ্যতা সাধারণত হিন্দু ধর্মের বর্ণভেদ পদ্ধতিতে লক্ষ্য করা যায়।

উচ্চজাতির মানুষেরা অর্থাৎ বর্ণহিন্দুরা নিম্নবর্ণের মানুষ শূদ্রদের অপবিত্র এবং অস্পৃশ্যরূপে গণ্য করেন। অস্পৃশ্য জাতি বলতে বোঝায় হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণের মানবগোষ্ঠীকে যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী উচ্চবর্ণের দ্বারা নির্যাতিত তাদের বোঝায়। বর্ণহিন্দুরা অস্পৃশ্যদের কূপ, ধর্মশালা, শ্মশান, রাস্তাঘাট ইত্যাদি ব্যবহার করতে দিত না। উচ্চবর্ণের মানুষেরা সমাজে অস্পৃশ্যদের দেওয়া খাদ্য পানীয়সহ কোন কিছুই গ্রহণ করত না। হিন্দু মন্দিরের মধ্যে অস্পৃশ্যদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। সামাজিক স্তর বিন্যাস তথা সামাজিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যরা ছিল ঘৃণিত। অপমান, ঘৃণা, অবিচার, দারিদ্র্য ও গ্লানি সহ্য করে অচ্ছুৎ অস্পৃশ্যদের একান্তে পৃথকভাবে বসবাস করতে হত।

জাতিভেদ প্রথার প্রকট নিদর্শন রয়েছে *মনুসংহিতা*'য় । *মনুসংহিতা*'য় অস্পৃশ্য নির্যাতিত শূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষকে ঘৃণার অন্ধকারে নির্বাসিত করা হয়েছে। *মনুসংহিতা*'র পরতে পরতে উচ্চবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিম্নবর্ণ শূদ্রের নিপীড়ন ও বঞ্চনার কৌশল বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রেও শূদ্রের প্রতি চরম অবিচার করা হয়েছে। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে,

''চণ্ডালশ্বপচানাং তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দভম্।।''[২]

''চণ্ডাল, শ্বপচ প্রভৃতি জাতির বাসস্থান হবে গ্রামের বাইরে। এইসব জাতিকে 'অপপাত্র' করে দিতে হয়; কুকুর এবং গাধা হবে তাদের ধনস্বরূপ''। নিম্নবর্ণের মানুষদের পশুসুলভ অমানবিক অত্যাচারের কথা মনুসংহিতায় রয়েছে। অন্ত্যজ শূদ্রদের অশূচি, অস্পৃশ্য ঘোষণা করে বলা হয়েছে ,

''ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চাণ্ডালৈর্ন পুক্কশৈঃ।
ন মূর্খৈণাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ।।''[৩]

''পতিত (অধার্মিক), চণ্ডাল, পুক্কশ (ব্রহ্মণের ঔরসে শূদ্রা নারীর গর্ভ থেকে জাত সন্তানের নাম 'নিষাদ', উক্ত নিষাদের ঔরসে শূদ্রা নারীর গর্ভ থেকে যে জন্মগ্রহণ করে তাকে 'পুক্কশ' বলা হয়), মূর্খ ও ধনাদি মদে গর্বিত, অন্ত্যজ (রজকাদি নীচ জাতি), অন্ত্যাবসায়ী (নিষাদপত্নীতে চণ্ডাল পুরুষ দ্বারা জাত পুত্র), এদের সাথে (বৃক্ষাদির ছায়াতেও) একত্রোপবেশনাদি ব্যবহার করবে না''। 'মনুসংহিতা' শূদ্রকে দাসরূপে দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছে। এই সংহিতায় বিধান দেওয়া হয়,

''একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া।।''[৪]

''প্রভু ব্রহ্মা শূদ্রের জন্য একটি কাজই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন , তা হল কোনও অসূয়া অর্থাৎ নিন্দা না করে (অর্থাৎ অকপটভাবে) এই তিন বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষা করা'' ।

বাবাসাহেব আম্বেদকর হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। অস্পৃশ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করে জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একক প্রচেষ্টায়, অদম্য অধ্যবসায় এবং আত্মত্যাগ, ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠা, অস্পৃশ্যদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় ভীমরাও আম্বেদকরের অবদান ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। ড. আম্বেদকর হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণ পদ্ধতি বা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। কারণ তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষের মতো দেশে সামাজিক বৈষম্যের মূল হিন্দু বর্ণব্যবস্থার মধ্যে নিহিত আছে। ড. আম্বেদকরের মতে, বর্ণাশ্রম অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক এবং অদূরদর্শিতাপূর্ণ একটি ব্যবস্থা। প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রে জাতিভেদের অযৌক্তিক কথা নেই বলে তিনি মনে করতেন। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা আপন আপন স্বার্থে শাস্ত্র তৈরী করে সেগুলিকে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন, জাতিভেদ প্রথা থেকেই অস্পৃশ্যতার জন্ম।

বাবাসাহেব আম্বেদকরের মতে অস্পৃশ্যতা যুগ যুগান্ত ধরে হিন্দু সমাজের বিরাট অংশের মানুষের আত্মবিশ্বাস ধ্বংস করেছে। তাই আম্বেদকরের সংগ্রামের একটি দিক হল ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্ম, তার বর্ণভেদ ব্যবস্থা ও সবশেষে জাতপাত ব্যবস্থার বিরোধিতা করা। তিনি মনে করতেন ভারতের জাতিভেদপ্রথার ভিত্তিতে পেশাগত সামাজিক স্তর বিন্যাস সৃষ্টি হয়েছে। আম্বেদকরের মতে, হিন্দু সমাজের সংস্কার করতে হলে সবার প্রথমে প্রয়োজন বর্ণাশ্রম এবং জাত ব্যবস্থার বিলোপ ঘটানো। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জাতপাতের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর মতে ''হিন্দুদের নৈতিকতায় জাতের প্রভাব নিরতিশয়ভাবে শোচনীয়। এই জাত বিভাগ জনশক্তিকে হত্যা করেছে। সাধারণ দয়া-দাক্ষিণ্যকেও ধ্বংস করেছে। জাত জনমতকে অসম্ভব করে তুলেছে। জাত-ই হিন্দুর জনগণ। তার দায়-দায়িত্ব শুধু তার জাত-ব্যবস্থার প্রতি। তার আনুগত্যই সেই জাতপাতে সীমাবদ্ধ। সদ্‌গুণ জাত-নির্ভর এবং তার নৈতিকতাও জাতপাতের সীমানায় ঘেরা। উপযুক্তের প্রতি কোনও সহানুভূতি নেই। মেধাবী মানুষের জন্য কোনও সমাদর নেই। যার প্রয়োজন আছে, তার জন্য দয়া নেই। পীড়িতের ডাকে কোনও সাড়া নেই। দয়া আছে, যার শুরু এবং শেষ, জাতপাতে। সহানুভূতি আছে, কিন্তু ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য নেই। একজন হিন্দু কি একজন মহান ও সজ্জন মানুষের নেতৃত্ব স্বীকার ও অনুসরণ করবে?''[৫]

অস্পৃশ্যতা বিরোধী সংগ্রাম করতে গিয়ে আম্বেদকর বুঝেছিলেন বলিষ্ঠ সংগঠন এবং সেই সংগঠনের স্বাধীন মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা। বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর এই সময় অস্পৃশ্যদের শিক্ষাবিস্তার ও জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে শূদ্র সম্প্রদায়ের চেতনাকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে কোলাপুরের মহারাজের আর্থিক সহযোগিতায় ১৯২০ সালে মূকনায়ক (Leader of Voiceless) নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি একটি নতুন প্রজন্মের আবির্ভাবের বার্তা ঘোষণা করেছিলেন। এই নতুন প্রজন্ম জাতিবৈষম্যের রাজনীতিকে ধ্বংস করে এক নতুন দিশার পথে এগিয়ে যাবার রসদ পেয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত দলিত সম্প্রদায়ের বক্তব্য শোনার মতো উদার মানসিকতার পরিচয় উচ্চবর্ণের নেতৃত্ব দিতে পারেননি। 'মূকনায়ক' পত্রিকা সেই শব্দহীন জাতির কান্নার শব্দ দিয়ে রচিত জীবনের যন্ত্রণাগীতকে সমাজের কাছে উপস্থাপিত করেছিল। আসলে ভীমরাও আম্বেদকর চেয়েছিলেন শব্দহীন সম্প্রদায়ের শব্দকে যথার্থ অর্থে এবং সঠিক উপায়ে তথাকথিত শব্দমুখর সমাজের আঙিনায় পৌঁছে দিতে। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে হিন্দু সমাজে সামাজিক বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা ব্যাপক অর্থে প্রচলিত। কারণ এর মূলে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন জাতিবৈষম্য, যা বর্ণাশ্রম প্রথার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাবাসাহেব আম্বেদকর সারাজীবন লক্ষ-লক্ষ অবদমিত মানুষের ন্যায়বিচার, সামাজিক মর্যাদা এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমাজে পিছিয়ে পড়া অবদমিত, বঞ্চিত বা অস্পৃশ্য মানুষের সচেতনতা ছাড়া তাদের সামাজিক উন্নতি কখনো সম্ভব নয়।

বাবাসাহেব আম্বেদকর ছিলেন কণ্ঠস্বরহীনদের কণ্ঠস্বর, আশাহীনদের আশা এবং সর্বোপরি অন্ধকারে আলোর দিশারী। ড. আম্বেদকরের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল সবার প্রথমে প্রয়োজন অস্পৃশ্য মানুষের সামাজিক অধিকার। অস্পৃশ্য শূদ্র সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে সংগ্রাম করেছিলেন তার মূলমন্ত্র ছিল আত্মনির্ভরতা, আত্মউন্নয়ন এবং আত্মসম্মান। অস্পৃশ্যদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করে গিয়েছেন। বাবাসাহেব আম্বেদকর বৃহত্তর সমাজ জীবনের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। সে কারণে তিনি অস্পৃশ্য ও বঞ্চিতদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৩ সালে বোম্বের প্রাদেশিক আইন সভায় 'বোলে প্রস্তাব' গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী সাধারণের ব্যবহৃত জলাশয়, ধর্মশালা, বিদ্যালয়, সরকারী অফিস, আদালত, হাসপাতাল অন্যান্যদের সঙ্গে সমান অধিকার অস্পৃশ্যদেরও। এই প্রস্তাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মাহাদ মিউনিসিপ্যালিটি ১৯২৪ সালে চৌদাপুকুরকে অস্পৃশ্যদের জন্য মুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু বিষয়টি গৃহীত সিদ্ধান্তরূপেই থেকে যায়, কার্যত উচ্চবর্ণেরা এবং মনুষ্যেতর প্রাণীরা জল অবাধে ব্যবহার করলেও অস্পৃশ্যদের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ বলবৎ থাকে। অস্পৃশ্যদের অধিকার সীমাবদ্ধ থাকার জন্য ১৯২৭ সালে ১৯ শে ও ২০ শে মার্চ ড. আম্বেদকর সরাসরি আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি একটি সম্মেলনের আহ্বান করলেন। ড. আম্বেদকরের জ্বালাময়ী ভাষণে

উদ্দীপিত হয়ে অস্পৃশ্যরা তাদের হাজার হাজার বছরের অপমান দূর করে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে আম্বেদকর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ঐতিহাসিক শোভাযাত্রাসহ চৌদারপুকুর অভিমুখে অগ্রসর হন। ড. আম্বেদকর প্রথম জলস্পর্শ করেন ও পান করেন এবং শত শত বছরের অস্পৃশ্যদের অনধিকার ভেঙ্গে দেন। হাজার হাজার মানুষের জয়ধ্বনিতে চৌদাপুকুর প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে। ড. আম্বেদকরকে এই সময় সকলে 'বাবাসাহেব' আখ্যায় সম্মানিত করেন। সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাবাসাহেব আম্বেদকরের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য এই ভাবেই এসে উপস্থিত হয়।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাবাসাহেব আম্বেদকরের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ দলিতদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার। অস্পৃশ্যদের হিন্দুমন্দিরে প্রবেশের অধিকার ছিল না। এই অসাম্য ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলেন আম্বেদকর। এর প্রতিবাদে ড. আম্বেদকর ১৯২৭ সালে এক সভায় সব হিন্দু মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকারের কথা বলেন। মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিয়ে বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে অস্পৃশ্য হিন্দুদের বিবাদ এবং তার প্রতিবাদে অস্পৃশ্যদের সংগ্রামে ড. আম্বেদকরকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে বারবার। তিনি শত শত অনুগামীদের নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশের অভিযান চালালেন। কারণ এতদিন এইসব মন্দিরের দরজা অস্পৃশ্যদের সামনে রুদ্ধ ছিল। দৃঢ় ও শক্তিশালী সংগ্রামে অস্পৃশ্যদের নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে বাবাসাহেব আম্বেদকর বুঝিয়ে ছিলেন অস্পৃশ্য মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক ন্যায় পাবার অধিকার আছে। ড. আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশ সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য ছিল, দলিতদের সামাজিক অধিকার এবং মানবিক সম্মান প্রতিষ্ঠা করা।

১৯২৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে বাবাসাহেব আম্বেদকর 'বহিষ্কৃত ভারত' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। সেখানে অস্পৃশ্যদের বিভিন্ন দাবিগুলি তুলে ধরলেন এবং অন্যায় আচরণের প্রতিবাদের কথাও বললেন। অর্থাৎ অস্পৃশ্য শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে 'বহিষ্কৃত ভারত' প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯২৪ সালে অস্পৃশ্যদের পক্ষে ড. আম্বেদকর অস্পৃশ্য জনসম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে গঠন করেন 'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা'। তিনি অস্পৃশ্যদের ওপর থেকে নানান বাধা নিষেধ দূর করার জন্য একটি সমিতিও গঠন করেন। ১৯২৮ সালে তিনি গঠন করেন 'ডিপ্রেসড ক্লাসেস এডুকেশন সোসাইটি'। যার প্রধান লক্ষ্য ছিল নির্যাতিত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের হোস্টেলে থেকে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা। আম্বেদকর মনে করেন অস্পৃশ্য মানুষের মুক্তি তখনই আসবে যখন তারা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করবে। সে কারণে তিনি অস্পৃশ্য মানুষদের সামাজিক, আর্থিক এবং শিক্ষা বিষয়ে অনুসন্ধান করে তাদের উন্নয়নে সোসাইটি গঠন করে কাজ চালান।

জাতপাত এবং বর্ণভেদ ব্যবস্থাকে শক্তভিতের উপর দাঁড় করানোয় *মনুস্মৃতি*র বিশেষ ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয়। ড. আম্বেদকর অস্পৃশ্যতা বিরোধী সংগ্রামের বিভিন্ন সভা সমিতিতে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুগ্রন্থ *মনুসংহিতা*'র তীব্র নিন্দা করেন। প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯২৭ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর ভস্মীভূত করা হয় *মনুসংহিতা*কে। কারণ এই শাস্ত্রে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণগনই পৃথিবীর অধীশ্বর এবং শূদ্র মাত্রেই দাস, শূদ্রের সম্পদ সঞ্চয় করাও অপরাধ। ড. আম্বেদকরের মনে হয়েছে এই শাস্ত্র শূদ্রজাতির চরম সর্বনাশা গ্রন্থ, ছিনিয়ে নিয়েছে অস্পৃশ্যদের সবকিছু অধিকার। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় যুগ যুগ ধরে অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের মানুষ উপেক্ষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাবাসাহেব আম্বদকরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ফ্রান্সাইজ কমিটির অধিবেশনে অস্পৃশ্য শূদ্র শ্রেণী সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়। তা অনুসারে হিন্দু সমাজে যাঁদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হয় তাঁরাই পরিচিত হবেন 'নির্যাতিত শ্রেণী' (Depressed Classes) র জনগণরূপে। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাক ডোনাল্ড 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নীতি ঘোষণা করেন। গান্ধীজী হিন্দুদের মধ্যে অনুন্নত শ্রেণীর পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে ভোট দেবার অধিকারের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পুণার জেলে তিনি আমরণ অনশন শুরু করেন। গান্ধীজী অনশন শুরু করলে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি লক্ষ্য করে ড. আম্বেদকর পুনা চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী যৌথ নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুন্নত সম্প্রদায় থেকে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা এবং বৃহত্তর অর্থে অবদমিত শ্রেণী সমূহকে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করা হয়।

ভারতে হিন্দু সমাজে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের কয়েক হাজার বছর ধরে ছিল না কোনও সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার। তারা এক ধরণের সামাজিক দাসত্বের জীবন যাপন করত। বর্ণাশ্রম, জাতব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁর সুচিন্তিত অভিমত বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁর 'Annihilation of Caste' গ্রন্থে বলেছেন,

"১. জাতিব্যবস্থা হিন্দুদের ধ্বংস করেছে।

২. চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে হিন্দুসমাজকে সংস্কার করা অসম্ভব। কারণ, বর্ণব্যবস্থা হলো ফুটো পাত্রে জল ঢালার মতো। বর্ণব্যবস্থা কখনো নিজের ধর্ম রক্ষা করতে পারে না, সেটা শেষপর্যন্ত জাতিব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতে বাধ্য। কারণ, বর্ণব্যবস্থা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির কোনো ব্যবস্থা নেই।

৩. চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে হিন্দুসমাজকে পুণর্গঠন করা ক্ষতিকর। কারণ, বর্ণব্যবস্থা জনগণকে জ্ঞানার্জনে বাধা দেয় এবং অস্ত্রবিদ্যা-শিক্ষাবিহীন নপুংসকে পরিণত করেছে।

৪. হিন্দুসমাজকে এমনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে যাতে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নীতি কার্যকর হয়।

৫. এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য জাতি এবং বর্ণের পিছনে ধর্মীয় সমর্থন বন্ধ করতে হবে।

৬. জাতি ও বর্ণের পিছন থেকে ধর্মীয় সমর্থন তখনই বন্ধ করা সম্ভব হবে, যখন শাস্ত্রগ্রন্থের ঐশ্বরিক তত্ত্বকে অস্বীকার করা হবে।"[৬]

বাবাসাহেব আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের এই সামাজিক বন্ধনদশা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। কারণ তিনি নিজেও তাঁর জীবনে বহুবার সামাজিক দাসত্বের শিকার হয়েছেন। বর্ণবাদী সমাজ কাঠামোয় শূদ্র সমাজ যুগ যুগ ধরে পড়ে আছে নিষ্পেষিত ও অবহেলিত হয়ে। অস্পৃশ্য মানুষদের মানুষ হিসাবে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বাবাসাহেব আম্বেদকর যে দীর্ঘ আন্দোলন করেছেন তা ভারতবর্ষের সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

অস্পৃশ্য শূদ্রদের অধিকার চেতনা অনেকখানি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়ায় যখন থেকে ড. আম্বেদকর নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'Independence Labour Party', ১৯৪২ সালে তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'All India Scheduled Castes Federation', ১৯৪৫ সালে তিনি গড়ে তোলেন 'People's Education Society'। আম্বেদকর উপলব্ধি করেছিলেন যে অস্পৃশ্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চাই রাজনৈতিক ক্ষমতা, আধুনিক শিক্ষা ও সংগঠন। দলিত সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর রণধ্বনি ছিল Educate, Agitate and Organise। আম্বেদকরের জীবনদর্শন অনুসরণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বৈষম্যমূলক সমাজের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়ে বৈষম্যহীন এক সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

বাবাসাহেব আম্বেদকর সমাজের প্রান্তিক মানুষদের জন্য আজীবন সংগ্রামের কথা ভেবেছিলেন। সামাজিক গণতন্ত্রে তিনি সকলের জন্য সমান সুযোগ ও ন্যায়বিচার দানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি মনে করেন স্বাধীনতা ও সাম্য অর্জনে নৈতিকতার ভূমিকা অপরিহার্য। তিনি বলতেন "Religion is for man and not man for religion"[৭] অর্থাৎ ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নয়। যে ধর্ম মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করে না, তৃষ্ণার জলটুকুও নির্মমতার সঙ্গে সরিয়ে নেয়, সেই ধর্ম আর যাই হোক, কোন ধর্ম নয়। তাঁর মতে, "Religion must be judged by social standards based on social ethics. No other standard would have any meaning if religion is held to be a necessary good for that well-being of the people."[৮]

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, বাবাসাহেব আম্বেদকরের সমাজ দর্শন তিনটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সাম্য, মুক্তি ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ। তিনি বলেছেন, "It is not enough for religion to consist of a moral code, but its moral code must recognise the fundamental tents of liberty, equality and fraternity. Unless a religion recognises these three fundamental principles of social life, religion will be doomed."[৯]

অর্থাৎ ধর্মের কেবল নৈতিক বিধান থাকলেই হবে না, সেই নৈতিক বিধান সমূহকে অবশ্যই স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধের

মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিতে হবে। যদি কোন ধর্ম সমাজ জীবনের এই তিনটি মৌলিক নীতিকে স্বীকৃত না দেয় তাহলে সেই ধর্ম অবধারিতভাবে সর্বনাশের দিকে যাত্রা করবে। একথা ভুললে চলবে না যে, ড. আম্বেদকরের লক্ষ্য এখানে তথাকথিত হিন্দুধর্ম, যেখানে সচেতনভাবে এবং সুচতুরভাবে সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছ থেকে সমাজ জীবনের এই মৌলিক আদর্শগুলিকে হরণ করা হয়েছে। এর ফলে হিন্দু ধর্ম যে কোন্‌দিকে যাত্রা করছে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আম্বেদকর দিয়েছেন। তাঁর কাছে তথাকথিত হিন্দুধর্ম স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্বের ধারণা ছাড়া আচার সর্বস্ব শূণ্যগর্ভে পরিণত হয়েছে। সুতরাং, এই ধর্মের সংস্কার অনতিবিলম্বে প্রয়োজন। তা না হলে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের দ্বারা নিম্নবর্ণের মানুষের শোষণ, এমনকি মানুষ বলে স্বীকৃতি না দেওয়ার প্রবণতা একদিন সমগ্র সমাজকে ভয়ংকর বিপদের দিকে ঠেলে দেবে।

তিনি বুঝেছিলেন সামাজিক বৈষম্য দূর না করলে অস্পৃশ্যতার বন্ধনমোচন সম্ভব নয়। অস্পৃশ্য শূদ্রদের প্রতি আচরণ যে যথার্থ অর্থে বৈষম্যমূলক এবং তা যে মানবতা বিরোধী সে বিষয়টি ড. আম্বেদকর প্রতিষ্ঠা করেছেন। Liberty, Equality, Fraternity এই তিনটি আদর্শের উপর ভিত্তি করে তিনি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষায়, "My ideal would be a society based on Liberty, Equality and Fraternity."[১০] বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁর দর্শনে সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সাম্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "If all men are equal, all men are of the same essence and the common essence entitled them to the same fundamental rights and to equal liberty."[১১] বাবাসাহেব আম্বেদকরের কাছে ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল একটি অন্যতম পবিত্র বিষয়। মানবতা ও ধর্মের অপর রূপ হল সমভ্রাতৃত্ব। আম্বেদকর বলেছেন, "Fraternity is the name for disposition of an individual to treat-men as the object of reverence and love and the desire to be in unity with his fellow beings"[১২] অন্যদিকে বাবাসাহেব আম্বেদকরের কাছে স্বাধীনতা হল— Civil Liberty এবং Political Liberty। তিনি Civil Liberty কে শুধু গুরুত্বপূর্ণ বলেননি আবশ্যিকও বলেছেন। বাবাসাহেব আম্বেদকরের ভাষায়, "Civil Liberty refers to (1) liberty of movement which is another name for freedom from arrest without due process of law (2) liberty of speech (which of course includes liberty of thought, liberty of reading, writing and discussion) and (3) liberty of action."[১৩] অন্যদিকে বাবাসাহেব আম্বেদকরের ভাষায়, "Political liberty consists in the right of the individual to share in the framing of laws and in the making and unmaking of governments."[১৪]

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে বাবাসাহেব আম্বেদকর স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ— এই তিনটি মূল আদর্শকে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ভিত্তি বলে গণ্য করেছেন। মনে রাখতে হবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা সামাজিক বা ধর্মীয় বা এই তিনটিকে একত্রে প্রতিষ্ঠা করার কথাকে বোঝায় না। যদি আমরা এই তিনটি ধারণার উৎসের অনুসন্ধান করি তাহলে দেখা যাবে যে ড. আম্বেদকরের এই ত্রিস্তম্ভ এক ও অভিন্ন চেতনা থেকে উৎসারিত। একথা ঠিক যে, ড. আম্বেদকর সেই অভিন্ন চেতনার উৎস সন্ধানে সময় ব্যায় করেন নি এবং তার কাছে উৎস সন্ধান করার প্রয়োজনীয়ও নয়। কারণ তিনি চেয়েছিলেন তীব্র অস্পৃশ্যতা বিরোধী সংগ্রাম গড়ে তুলে শূদ্র মুক্তির পথকে প্রশস্ত করতে। তবে গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে তার সমাজ দর্শনের মূল ত্রিস্তম্ভের ভিত্তি স্বরূপ যে এক চেতন স্তম্ভ রয়েছে-তাঁকে অস্বীকার করা যাবে না। আসলে বাবাসাহেব আম্বেদকর প্রয়োগের দিকটিকে জোর দিয়েছেন বলেই তিনি তাঁর সমগ্র দর্শনচিন্তাকে এই ত্রিস্তম্ভের কথা স্বীকার করে একটি প্রায়োগিক আকার দিতে চেয়েছেন।

ড. আম্বেদকরের সংগ্রামের প্রতিফলন ঘটেছে সংবিধানের বিভিন্ন ধারায়। সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর ভূমিকা ও অবদান তাঁকে ভারতীয় সংবিধানের পিতার মর্যাদায় বসিয়েছে। সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদে আইনের চোখে সমতা বা আইনের দ্বারা সমানভাবে রক্ষিত হওয়ার মূলনীতিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। ১৫ নং অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের জন্য সম সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ, জন্মস্থানের

ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের ২ ধারায় বলা হয়েছে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও প্রমোদস্থানে প্রবেশ এবং সরকারি অর্থে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত কিংবা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কূপ, জলাশয়, স্নানাগার, পথ ও জনসমাগমের স্থান ব্যবহারের অধিকার থেকে কোনও নাগরিককে বঞ্চিত করা যাবে না। ১৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সরকারী কাজের ক্ষেত্রে কোন রকম বৈষম্য করা যাবে না। এই অনুচ্ছেদের চতুর্থ ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র প্রয়োজন মনে করলে অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য সরকারি পদ বা চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতার বিলোপ ঘোষণা করা হয়েছে। অস্পৃশ্য আচরণ করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ৪৬ নং ধারায় বলা হয়েছে তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি এবং সামাজিক অন্যায় ও সর্বপ্রকার শোষণের হাত থেকে রাষ্ট্র রক্ষা করবে। এছাড়াও সংবিধানের বিভিন্ন অংশে বিবিধ সুরক্ষামূলক সদিচ্ছার ব্যবস্থা আছে।

সংবিধানে উপরিউক্ত ধারাগুলি অন্তর্ভুক্ত করার ভিত্তি হিসাবে বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের দলিত তথা শূদ্র মুক্তির দর্শনচিন্তা যে রয়েছে— সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। বস্তুত তিনি এখানে সংবিধান রচনার সময় তাঁর দলিত মুক্তি আন্দোলনের দর্শনের সার বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। তিনি সর্বান্তকরণে মনে করতেন যে দলিত মুক্তির জন্য যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন তার আইনি স্বীকৃতি না হলে এবং সরকারী দায়বদ্ধতার জায়গা তৈরী না হলে স্বাধীন ভারতবর্ষে দলিত তথা শূদ্র সম্প্রদায় পরাধীন জাতির মতোই অবস্থান করতে বাধ্য হবে। দলিতের কণ্ঠস্বর তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ যারা দেশ পরিচালনার সম্ভাব্য নেতৃত্ব, তাদের কানে পৌঁছবে না। শুধু তাই নয় দলিত সম্প্রদায়ের মুক্তির বাণী দলিত শ্রেণীর মানুষের কণ্ঠ থেকে ধ্বণিত হওয়ার প্রয়োজন। তাই সংবিধানের প্রতিটি পরতে পরতে বাবাসাহেব আম্বেদকরের দলিত তথা শূদ্র মুক্তি দর্শনের ভাবনা উপস্থাপিত হয়েছে এবং একই সঙ্গে তাদের নেতৃত্ব দানের জায়গা তৈরী করেছে।

অস্পৃশ্যদের অসহায় অবস্থা ড. আম্বেদকরের মনের গভীরে সৃষ্টি করেছিল গভীর যন্ত্রনা এবং এইসব মানুষদের প্রতি তাঁর অপার মমত্ববোধ। সে কারণে তাঁর জীবনের ব্রতই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমাজের এই বৈষম্য দূর করা। বাবাসাহেব আম্বেদকর লক্ষ্যে করেছিলেন সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এবং অস্পৃশ্যদের আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দিয়ে সমাজের অস্পৃশ্য দলিতদের সামাজিক অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সর্বজনীন শিক্ষার সুবিধাগুলি সমাজে উচ্চবর্গের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যদি সমাজে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সম্প্রসারণ করা হয় তাহলে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, সামাজিক অগ্রগতি ঘটবে এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "Untouchability shuts all doors of opportunities for betterment in life for untouchables. It does not offer an untouchable any opportunity to move freely in society, it compels him to live in *dungeons* and seclusion; it prevents him from educating himself and following a profession of his choice."[১৫]

হিন্দুদের নীতিশাস্ত্রের উপর জাতিভেদ প্রথার প্রভাব অত্যন্ত শোচনীয়। ড. আম্বেদকর মনে করেন জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজের শ্বাস-প্রশ্বাসে পরিণত হয়েছে। বর্ণ হিন্দুদের নৈতিকতাবোধ, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বিচার্য নয়; বিচার্য হল শুধু জাত। বাবাসাহেব আম্বেদকর মনে করতেন, নৈতিক মান উন্নত হলে আর কোন কিছুর প্রয়োজন থাকে না। তাঁর ভাষায়, "There is nothing fixed, nothing eternal, nothing *Sanatan*; that is changing, that change is the law of life for individuals as well as for society."[১৬]

বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের এই বক্তব্যটি বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র। বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদে কোন কিছুকেই শাশ্বত বা চিরন্তন সত্ত্বার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি; যেখানে সবকিছুকেই পরিবর্তনশীলতার অমোঘ নিয়মে আবদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বাবাসাহেব আম্বেদকরও তাঁর দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, এই জগতে কোন

কিছুই শাশ্বত বা সনাতন নয়, সবকিছুই পরিবর্তনশীল। এর কারণ হিসাবে তিনি দাবী করেছেন যে, এই পরিবর্তনই ব্যক্তি জীবনে এবং সমাজ জীবনের মূল নীতি। তাঁর এই ঘোষণা ভারতীয় সমাজের অচলায়তনকে ভেঙ্গে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়ার রসদ স্বরূপ।

আম্বেদকরের মতে জাতিভেদ প্রথা থাকার ফলে হিন্দু জীবন এক এবং হিন্দুরা এক জাতি এই চেতনাবোধ গড়ে ওঠেনি। যতদিন জাতিভেদ প্রথা থাকবে ততদিন হিন্দুদের মধ্যে দুর্বলতা এবং কাপুরুষতা বজায় থাকবে। জাতিব্যবস্থা ঈশ্বর নির্দেশিত পবিত্র ব্যবস্থা , এই বিশ্বাসকে ধ্বংস করতে না পারলে জাতিভেদ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বাবাসাহেব আম্বেদকর দাবি করেন যে হিন্দু সমাজের প্রাচীন নিয়মগুলি বিলোপ করা দরকার। বাবাসাহেব আম্বেদকর ধর্ম বিরোধী নন। তার কারণ তাঁর আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে না, বরং তথাকথিত ধর্মের মোড়কে উপস্থাপিত সামাজিক আচার-আচরণ, বর্ণবৈষম্য ইত্যাদির প্রয়োগের বিরোধিতা করেছেন। আম্বেদকরের মতে ধর্ম হবে নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যে নৈতিকতা মনুষ্যত্বের বিকাশের সহায়ক। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে—"In Dhamma there is no place for prayers, pilgrimages, rituals, ceremonies or sacrifices. Morality is the essence of Dhamma. Without it there is no Dhamma."[১৭]

ড. ভীমরাও আম্বেদকরের এই বক্তব্য থেকে আমরা একইসঙ্গে ধর্ম কি নয় এবং স্বরূপত ধর্ম কি— এই দুটি চিরন্তন জিজ্ঞাসার সহজ সমাধানের ইঙ্গিত পাচ্ছি। 'ধর্ম' কথাটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল ধারণ করা। অথচ ধর্মের সামাজিক প্রয়োগে এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ধর্ম ধারণ করার পরিবর্তে শ্রেণী বৈষম্যের আধার হয়ে ওঠে। এর কারণ হল ধর্মের সারসত্ত্বা অর্থাৎ নৈতিকতাকে বর্জন করে আচার সর্বস্ব করে তোলা। ধর্ম আচার সর্বস্বতায় পরিণত হলে, তা আর ধর্ম থাকে না; তা হয়ে ওঠে দুর্বল পীড়নের মোক্ষম উপায়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ঠিক এই জায়গাতেই ধর্মকে স্থাপন করে দলিত শোষণের রথকে সচল রেখেছে। বাবাসাহেব আম্বেদকর ধর্মকে নৈতিকতার আধারে স্থাপিত করে শুধু যে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটিকে তুলে ধরেছেন তাই নয়, একই সঙ্গে সামাজিক শোষণের জন্য দলিত নীপিড়নের মূল ক্ষেত্রটিকেও চিহ্নিত করেছেন।

বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংগ্রাম কাদের পক্ষে এবং কাদের বিরুদ্ধে? ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে নাকি ব্রাহ্মণত্বের বিরুদ্ধে নাকি প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের যে সামাজিক আচরণ তার বিরুদ্ধে? বাবাসাহেব আম্বেদকরের আন্দোলন ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বা ব্রাহ্মণত্বের বিরুদ্ধে নয়, তাঁর আন্দোলন একটি সামাজিক শক্তির বিরুদ্ধে যে শক্তি সুকৌশলে বঞ্চনার যন্ত্রণা চাপিয়ে দেয় বঞ্চিতদের উপর। 'দলিত' শব্দটির দ্বারা তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? 'দলিত' শব্দটি বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে বা বিশেষ কোন গোষ্ঠীকে বোঝাচ্ছে নাকি 'দলিত' শব্দটি একটা আদর্শকে বোঝাচ্ছে? এক্ষেত্রে আদর্শগত দিক থেকে বিষয়টিকে ধরলে ব্রাহ্মণত্ব আদর্শের বিরুদ্ধে দলিত আদর্শের সংগ্রামের বিষয়টি কেন্দ্রস্থলে উঠে আসবে। যদি ব্রাহ্মণদের আচরণকে ধরি সামাজিক আচরণ তাহলে দলিতদের বিরুদ্ধে তাদের সামাজিক অবস্থাটি স্পষ্ট হবে। অর্থাৎ দলিত সম্প্রদায় শোষিত এবং বঞ্চিত শ্রেণী হিসাবে যেভাবে সমাজে অবস্থান করছে তার বিপরীত অবস্থা, অর্থাৎ সামাজিক সম্মানের অবস্থাটি বোঝাবে। 'দলিত' শব্দটির রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহারের যে তাৎপর্য তাকে সরিয়ে রেখে এর দার্শনিক তাৎপর্যের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এই তাৎপর্য অনুসারে যারা শুধুমাত্র জন্মগত কারণে মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট হয়েও মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারাই দলিত। অর্থাৎ এখানে 'মানুষ' এই অর্থের বিস্ময়করভাবে অবমাননা হয়েছে। যেখানে মানব দর্শনের মূল লক্ষ্যই হল মনুষ্যত্বের বিকাশ, সেখানে মনুষ্যত্ব বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনা সংকুচিত হয়ে যাওয়া মানব দর্শন অনুমোদিত বিষয় হতে পারে না। যারা মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট হয়েও মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত শুধুমাত্র জন্মগত কারণে।

দলিতদের জন্য বাবাসাহেব আম্বেদকরের যে আন্দোলন এটাকে আমরা সামাজিক আন্দোলন বলব না ধর্মীয় আন্দোলন বলব না ঐতিহাসিক আন্দোলন বলব, নাকি তিনটির সমষ্টি বলব? গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে বোঝা যাবে এটি তিনটি আন্দোলনেরই

সমষ্টি। এটি একদিক থেকে ঐতিহাসিক কারণ এই রকম করে কেউ অস্পৃশ্য শূদ্রদের কথা ভাবেননি এবং এইরকম আন্দোলন এর আগে কেউ কখনও করেননি। এটা একদিক থেকে সামাজিক কারণ দলিতদের সামাজিক উন্নয়নের কথা তিনি ভেবেছেন। এটা আর এক দিক থেকে ধর্মীয় কারণ এটাকেই তিনি মানব ধর্ম বলে মনে করেছেন। একেই বলে মানব মুক্তির ধর্ম। এই ধর্ম কোন মন্দির-মসজিদের ধর্ম নয়, কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয়, এটা হচ্ছে তাঁর মানব ধর্ম। Human Being অর্থাৎ মানুষ হিসাবে তিনি চেয়েছেন যারা সাধারণভাবে বঞ্চিত-শোষিত হচ্ছে সেই Human Being এর মুক্তি হোক। মানবের মুক্তি, এটাই তাঁর ধর্ম।

মানব মুক্তির ধর্মকেই তিনি প্রয়োগ করেছেন। সেই সময়ে যে মানব মুক্তির একটা ধারা চলেছিল, আন্দোলন চলেছিল সেই আন্দোলনেরই একটা অংশ তিনি হয়ে উঠেছেন সেটাকে ব্যাখ্যা করে। এইখানেই তাঁর আন্দোলনকে ধর্মের স্তরে তিনি উন্নীত করেছেন বৌদ্ধ ধর্মের বিষয়টিকে নিয়ে এসে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যেন তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ধর্মের যে প্রচলিত ধারণা সেখান থেকে সরে এসেছেন। বৌদ্ধ ধর্মকে মানব মুক্তির ধর্মরূপে উপস্থাপিত করেছেন। হিন্দু ধর্ম কেমন হওয়া উচিত সেকথা বোঝাতে গিয়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং বাবাসাহেব আম্বেদকরের কাছে মানব মুক্তিই যথার্থ মুক্তি। তিনি দেখেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মে মানবমুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তাই তিনি সেটিকে সহজভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ড. আম্বেদকর সমস্ত ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের তুলনা করেছেন এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠধর্ম বলে অভিহিত করেছেন বৌদ্ধধর্মকে। তাঁর মতে বৌদ্ধধর্ম আসলে মানব মুক্তির ধর্ম। কারণ এই ধর্মে জাতপাত ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বর্জিত এবং নৈতিকতার আধারে আধারিত। বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি সমতা।

বৌদ্ধধর্মকে মানব মুক্তির ধর্মরূপে স্বীকার করেছেন। যুক্তি হিসাবে তিনি বলেন যে, ধর্ম মানুষের মনের সংস্কারকে দূর করবে, মনের পবিত্রতাকে প্রকাশ করবে। তাঁর মতে এই পবিত্রতা তিন ধরনের— শরীরের পবিত্রতা, মনের পবিত্রতা এবং বাক্য ব্যবহারের পবিত্রতা। এই পবিত্রতা রক্ষার জন্য ধার্মিক ব্যক্তিকে কতকগুলি বিষয় মেনে চলতে হয়। হিংসা মুক্ত হওয়া, অণৃত ভাষণ থেকে মুক্ত থাকা এবং অন্তরের দিক থেকে ন্যায়পরায়ণ হওয়া— এই বিষয়গুলোকে বোঝায়। এছাড়াও ধর্ম জীবনের পূর্ণতাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে, ধর্ম লোভ-লালসা মুক্ত হওয়ার প্রবণতাকে জাগ্রত করে। বৌদ্ধধর্মে এই বৈশিষ্টগুলি পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান।

এছাড়াও বাবাসাহেব আম্বেদকর মনে করেন যে ধর্ম কখনই মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কের দ্যোতক নয়, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের দ্যোতক। ধর্মের উদ্দেশ্যই হল একজন মানুষ আর একজন মানুষের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করবে, প্রীতবর্ধন করবে তারই শিক্ষা।[১৮]

এইদিক থেকে বিচার করলে হিন্দুধর্মের থেকে বৌদ্ধধর্ম যে শ্রেষ্ঠ— সেকথা সহজেই বোঝা যায়। তথাকথিত হিন্দুধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মাঝে জাতি ও বর্ণভেদের প্রাচীর তুলে একদল মানুষের দ্বারা আর একদল মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করতে শেখায়। শুধু তাই নয় ঈশ্বর নামক প্রকল্পকে হাতিয়ার করে সমাজের বুকে বৈষম্যের বীজকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করে।

বাবাসাহেব আম্বেদকর কখনই এক শ্রেণীর মানুষের মুক্তির কথা বলেননি। তিনি সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মুক্তির পথ খুলে দিয়েছেন। দলিতদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানবতার মুক্তি হল সমস্ত অত্যাচার, শোষণ থেকে মুক্তি। আর একদিক থেকে ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেও একথাটি প্রযোজ্য কারণ তাদের কুসংস্কারের থেকে মুক্তি, অহংবোধের থেকে মুক্তি, অমানবিক আদর্শ থেকে মুক্তি। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেও মুক্তি এবং শূদ্রদের ক্ষেত্রেও মুক্তি। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে মুক্তি অর্থনৈতিক বা সামাজিক অব্যবস্থা থেকে নয়, তাদের অন্তরের অব্যবস্থা থেকে মুক্তি। তাদের অন্তরে শূদ্রদের প্রতি যে নঞর্থক চিন্তাভাবনা আছে, মানবতার প্রতি নঞর্থক চিন্তাভাবনা আছে তার থেকে মুক্তি। সর্বশেষভাবে দলিতমুক্তি থেকে মানব মুক্তি স্তরে উন্নীত হচ্ছে ড. আম্বেদকরের ভাবনা। সবার ওপর মনুষ্যত্ব এটি ছিল বাবাসাহেব আম্বেদকরের দর্শনের মূল লক্ষ্য।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাবাসাহেব আম্বেদকরের শূদ্রমুক্তি আন্দোলন যথার্থ অর্থে মানব মুক্তি আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি নিজে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের যন্ত্রণা অনুভব করে বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষে এই কৃত্রিম জাতব্যবস্থা শুধু যে দলিতদেরই

অগ্রগতি স্তব্ধ করে দিয়েছে তা নয়, এই ব্যবস্থা ভারতীয় সনাতন আদর্শের মানব আত্মার অগ্রগতিকেই স্তব্ধ করে দিয়েছে। যেখানে কর্মের গুণে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চবর্ণে উন্নীত হতে পারত সেই সুযোগ বর্তমান ভারতে অনুপস্থিত। সুতরাং, এই ব্যবস্থা একধরণের চাপিয়ে দেওয়া অগ্রগতিপথরুদ্ধকারী ব্যবস্থা। তাই একথা বলতে হবে যে বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর দলিত উন্নয়ণের জন্য সংগ্রাম শুরু করলেও গুরুত্বের বিচারে তা কেবল দলিত মুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, অস্পৃশ্য দলিতদের মুক্তি ঘটলে অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে তা বৃহত্তর মানব মুক্তির আন্দোলনের অন্যতম সফলতার স্তম্ভ হিসাবে কাজ করবে। কারণ এই পথ ধরেই ধীরে ধীরে কৃত্রিম জাত ব্যবস্থা বিলুপ্ত হবে এবং সমগ্র ভারতবাসী মানবজাতিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করবে। এইভাবে ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণত্বের সীমানা ঘুঁচে গিয়ে মানবত্বের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। বাবাসাহেব আম্বেদকরের ভাবনার উত্তরণ ঘটছে দলিত মুক্তির স্তর থেকে মানব মুক্তির স্তরে। শূদ্র মুক্তি থেকে শুরু করে মানব মুক্তির আঙিনায় পৌঁছে যাওয়া— দার্শনিকতার বিচারে এটাই বাবাসাহেব আম্বেদকরের সার্থকতা।

তথ্যসূত্র

১. *ঋগ্বেদ,* ১০/৩২/১২

২. *মনুসংহিতা,* ১০/৫১

৩. *মনুসংহিতা,* ৪/৭৯

৪. *মনুসংহিতা,* ১/৯১

৫. বাবাসাহেব, ড. আম্বেদকর: *রচনাসম্ভার (বাংলা সংস্করণ)*, প্রথম খণ্ড, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, নিউ দিল্লী, ২০০০, পৃ. ৭৭।

৬. আম্বেদকর, ড. বি. আর: *জাতিপ্রথার বিলুপ্তি (Annihilation of Caste)*, জাগদীশচন্দ্র রায় (অনুবাদক), সহায়াদ্রি, মুম্বাই, ২০২০, পৃ. ৮৫।

৭. http-//www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00ambedkar/txt_ambedkar_salvation.html

৮. Ambedkar– Dr. Babasaheb: *Writings and Speeches*, Vol- 1, Dr. Ambedkar Foundation; Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India, New Delhi-110001, 2014, P. 94.

৯. Ibid, Vol-17 (Part-II), P. 104.

১০. Ambedkar, Dr. Babasaheb: *Writings and Speeches*, Vol-1, Dr. Ambedkar Foundation; Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India, New Delhi-110001, 2014, P. xi.

১১. Ambedkar, Dr. Babasaheb: *Writings and Speeches*, Vol-III, Dr. Ambedkar Foundation; Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India, New Delhi-110001, 2014, P. 25.

১২. Ibid, Vol-III, P. 97.

১৩. Ibid, Vol-III, P. 98.

১৪. Ibid, Vol-III, P. 98.

১৫. Keer, Dhananjay: *Dr. Ambedkar Life and Mission*, Popular Prakashan, Mumbai - 400034, 1990, P.92.

১৬. Ambedkar, Dr. Babasaheb: *Writings and Speeches*, Vol-I,Dr. Ambedkar Foundation; Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India, New Delhi-110001, 2014, P. 79.

১৭. Ambedkar, Dr. Babasaheb: *Writings and Speeches*, Vol-11, Dr. Ambedkar Foundation; Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India, New Delhi-110001, 2014, P. 323.

১৮. Ambedkar, B. R.: *The Buddha and His Dhamma,* People's Education Society, Ahmednagar, Bombay-I, 1957, P. 254